মানস চৌধুরী'র কবিতা

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য কবিতা

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য কবিতা
মানস চৌধুরী

প্রথম অনলাইন সংস্করণ, ২০০৫
সৃষ্টি ও স্বপ্নছেঁড়া
দ্বিতীয় অনলাইন সংস্করণ, ২০১২
বইয়ের দোকান

কপিরাইট : মানস চৌধুরী

প্রকাশক
বইয়ের দোকান
www. boierdokan.com

বইয়ের দোকানে প্রকাশের তারিখ : ২৩ মার্চ, ২০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী : রোহন কুদ্দুস

This is a collection of poems named ‘Inflenza O Onnanoo Kobita’ (Inflenza and Other Poems) by Manos Choudhury, published as e-book only.

*প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপতে হাপা অনেক বেশি এই সত্য মালুম করে **মানস চৌধুরী** গল্প-টল্প লিখতে শুরু করে কিছুদিন আগে, ২০০২ সালের শেষে। ‘সাহিত্যচর্চা’ করতে থাকা মানুষজন কবিতা না লিখলে ভাল দেখায় না – এই দুর্ভাবনায় দু’চারখানা কবিতার-মত-দেখতে বস্তুও লেখে। এই পাণ্ডুলিপি সেই দুর্ভাবনার একটা সাক্ষ্য। বলাই বাহুল্য এটিই তার প্রথম ‘কবিতা’-পাণ্ডুলিপি।*

কবিতাক্রম

প্যাথলজিক সময়
ঈগল দর্শন আর কবিদের ঘেটো
ইচ্ছামৃত্যু
টেলিফোন
বোতল ভরে জল
বন্ধুর শরীর
কাব্যরস
আসমানের নিচে খোদায়ী তমাল
লাল সাইকেলটা চীন থেকে আসা
যুক্তি-প্রযুক্তি-ভক্তি
দাঁড়িয়ে আছি
মধ্যরাতের সিন্দুক
কীর্তনিয়া
বুক ভেসে যায় রামপ্রসাদী সুরে
রাস্তা জানা আছে এই জ্ঞান এক প্রকার অহংকার বিশেষ
শেষরাত্রের বৃষ্টি
পতনকালের সখা
পিপীলিকার সারি
নাস্তা
আমার তখন কোলবালিশে মাথা
ইনফ্লুয়েঞ্জা
চড়ুইরা তবু আসে প্রতিবেশীর ছাদে
সম্পাদক নববান্ধবের কাছে পত্র
ম্যানুফ্যাকচারিং ঐক্য
কলকাতায় শিমুল-পলাশ
মিসেস ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ
গেরস্থালির আকাশ
খেচর-স্বভাব

প্যাথলজিক সময়

কতকাল মনে নেই, নির্ভার চলাচল ছিল
আমার আবাস দেহে নিশ্চিত ঈমান আমার,
ভুল হয়নি তো। এই দেহ কী ঠিকানা সাফ সাফ
পেয়ে গেছি খোঁজ—এই মতো বিশ্বাস জমে।
বিশ্বাস প্রতিক্রিয়া, জ্ঞানের এ ফলাফলে
দু প্রহর লড়াই চলে—এ ধারণা বরাবর
সতর্ক মেনে চলেছি, মেডিক্যাল জ্ঞান তাই
যুঝে গেছি দেহের ঈমানে।

এইবার পা পিছ্‌লে গেছে
আমার এ দেহখানি ধরা পড়ে মেডিক্যাল ফাঁদে
ল্যাবের টেবিলে বসে একবেলা নির্যাস ভরি
শিশি বোতলে—কফ, থুতু, রক্ত। উদোম খাড়িয়ে
থাকি সবচেয়ে কুৎসিত ফোটোর লোভে!
এরপর অপেক্ষার পালা...
পরিমাপ শাস্ত্রের জোর, মেপে দেয় দেমাকে
তোমার দেহ, দেহের ঠিকানা পাও তুমি।
এ দেমাক যোঝা বড় দায়। পরিমাপ
শাস্ত্রের জ্ঞান আর মেডিক্যাল জোর—
এ দাপট মোকাবিলা দায়। কাঁপে
পুরাতন বেবাক ঈমান, চারদিকে নির্ঘুম
নিযুত পতঙ্গ। তাদের সজাগ রেখে আমি
পাহারা দিই আমার ঈমান, অপেক্ষায়
দিনকাটে পরিমাপ কী ঠিকানা দেবে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২০ শে ফেব্রুয়ারী ২০০১

ঈগল দর্শন আর কবিদের ঘেটো

(কবি আল মাহমুদ-কে 'ঈগল থাকবে ইতিহাস থাকবে না' পড়ে)

তুমি কবে দেতেছো দ্যোতনা, সে হিসাব খোঁজ করি নাই—
দিনমান কেটে গেছে নন্দনের সেক্যুলার ভারে, সেইমত কাÉারী খুঁজি।
কী ঈমান লিখে গেছে কপালের দাগ কেটে কেটে, তারে আজ পাই শুধু পুঁজি,
আজ ঘাটে মড়ার সমুখে সোহাগ-তালাশে খুঁজি ঠাঁই।

কপট বান্ধবেরা বিবিধ কোরাসে গাহে চিৎকার-গীতি—
সে আওয়াজে চাপা পড়ে আমার পরান আর ক্ষয়ে যাওয়া আমাদের গাঁজনের গান।
কবিদের ঘেটো দ্যাখে মাথার ওপরে ওড়ে ঈগলের ছাপ নিয়ে বোমারু বিমান;
নিজের শবের সাথে তামাশার উৎসবে আধুনিক-রীতি।

সেই কবে চাঁদের আলোতে, কবির কবরে তুমি দেখেছো শেয়াল
তারপর নিজেদের ভুলে লোকালয়ে শেয়ালের সাথে আমাদের হতেছে খুব সহবাস
আধুনিক-স্বপ্নালু যারা কবরের পাশে গাঁথে সভ্য দেয়াল
মেধা আর প্রজ্ঞার ঝোল চেটে খায়—ইতিহাস বেয়ে ক্লিষ্ট রচনা চলে পরের আবাস।
বন্ধুর দরজায় কোন এক কালে তালাগুলো দেখে তুমি ছুঁয়েছো একেলা অবসাদ
গন্তব্যের খোঁজ নাই আজ বুঝি ভালো, বন্ধুহীন গহ্বরে নির্ভেজাল সভ্যতার প্রসাদ।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৬ জানুয়ারী ২০০২

ইচ্ছামৃত্যু

তবু এক অন্তহীন রাতে
আকাঙ্ক্ষার বেসামাল বোঝা ঝাঁপি খুলে উড়ে যেতে থাকে
সেই কালে ভূতের মতন, তোমাদের চক্ষুরাজি উন্মাতাল ডাকে
পিপাসায় আর্দ্র মন। তবু আহা চিরকাল ভুল পাঠ চলে
এইভাবে কোন্ দশী লুকোচোর বুক থেকে মৃদুস্বরে বলে
'ডুব দে। জল তোকে চাচ্ছে নাওয়াতে।'
চুলের গন্ধের ছাপ চারপাশে আতর ছড়িয়ে, কোনো দ্বিধা ফেলে না বিপাকে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২০ ফ্রেব্রুয়ারী ২০০২

টেলিফোন

আর সব ভুল হোক তবু, রিসিভার কানে চেপে
নিত্য সজাগ স্বভাবে হ্যালো করে ফেলি। তারপর
কথাগুলো এক একটি শব্দে জড়ো হতে থাকে। এইরূপ
শব্দরা আসে নিরুপায় টানা অভ্যাসে, কখনো কাটে না কোনো
তাল।

টেলিফোন যন্ত্রটা আমাদের কাটিয়েছে ভাষার আকাল।

সেই কবে ধারাপাত শেষে শহর মননে সব ব্যাকরণ
পুঁথি। ভাষাহীন গহ্বরে নিক্ষেপ চলে, মানুষেরা বলে—
কতকাল বলবার সাধ ছিল না যা। সাধ সব জন্ম নেয়
আধুনিক কালে, চারদিকে এলোমেলো, পুড়ে যায় নির্বিচার ভাষার
কপাল।

টেলিফোন যন্ত্রটা আমাদের কাটিয়েছে ভাষার আকাল।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৭ জানুয়ারী ২০০২

বোতল ভরে জল

বাতাসে উড়িয়ে দিলে সবগুলো মায়াবান হাত
নিবিড় চোখের কাল বলবতী স্নেহবতী নারী
এক পা হামাগুড়ি যাত্রায় অনিচ্ছার ছেদ।

মোটর ইঞ্জিনের পেটে তার চেয়ে দ্রুতগামী মন
পালকের মত ভাসে শবাকার পরিপাটি কায়া
ঝিমঝিম কাঁচ জুড়ে শ্রাবণের উন্মুল স্বেদ।

সেইকালে জলরাজি আবেশে সবুজ মনে পড়ে
আদর কালের স্রোত ভরিয়াছে কীভাবে কাহারে?
পণ্যের বোতল ভ'রে নির্বিকার অনাবিল ভার
আমাদের জীবনের এইটুকু স্থিত আবদার।

রাজশাহী থেকে ঢাকার বাস ॥ ১৩.০৮.০২

বন্ধুর শরীর

(জ্ঞানী বান্ধব আমার ভক্তিভাব ভুলে চারপাশে লালসা ছড়ায়,
আর... পিটানি খেয়ে নিরুচ্চার আমারে কাঁদায়)

শরীর উপাস্য বলে তিন কাল প্রহর গুনেছি
কোন ভাষা কোন শব্দে থই পেয়ে ঘুমঘোর কাটে
আঁজলাতে জল ভ'রে থাকি। সেই ত্বক, সেই আহা ঘামের বাহার
মলিন শৈশবে মাখে একালের ক্লিষ্ট-পানা রীতি।
সেই রূপ সেই কোন বিষাদ শরীর নিপাট দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রহার আঘাতে তবু সেই চেনা আর্তনাদ শরীর ছাপিয়ে
নামে। শব্দাবলী ভেসে যায়, সুরহারা পদাবলী ওঠে।
শরীর পূজেছো তুমি, রীতি ভুলে অসুরের ধ্যানে
শব্দমাখা শরীর কামনা, লাস্য ভুলে হাস্য ভুলে ক্রোধ
সেই আহা ঘামের শরীরে প্রহার মেখেছো!

শরীরের পথে এক কোনো রাস্তা হবে না কখনো।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১৯ জুলাই ২০০২

কাব্যরস

শব্দমালা কখনো আপনা আপনি উৎসারিত নয়।
বাতাসের পর বাতাসের ঢেউ এসে নানা রঙে
মনের ওপর ঝালর মেলে—আমরা বসন্ত বলে
মানি। তবু, এক খানা কবিতার পংক্তির জন্য
নির্ঘুম রাত্রি কেটে যায়... আমাদের অচলাঙ্গ মনের
পাথর পড়ে থাকে... এভাবে বসন্ত কেটে যায়। তবু
কবিতার পংক্তি লেখা হয় না।

শব্দমালা কখনো আপনা আপনি উৎসারিত নয়।
যেভাবে ভাবতে শিখি সেইমত ঘষে ঘষে
ভাষা। ভাবনার রাস্তা ধরে আবার ভাববার রাস্তা গড়ে দেয়।
যেভাবে দেখতে শিখি সেইমত চক্ষুজ্বালা শেষে
ভাষার উৎপত্তি। চোখের রাস্তা ধরে আর চোখের রাস্তা গড়ে দেয়।

যদি আত্মা মানো,
নিরাকার সে, রূপ রস বর্ণ গন্ধহীনা বটে। আত্মারা
আকার নেয় ভাষার ঢেউ চড়ে। আত্মা মায়া, শব্দ কায়া।
শব্দেরা নিমিত্ত মাত্র, আত্মাই কারণ।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৩ মার্চ, ২০০২

আসমানের নিচে খোদায়ী তমাল

আসমান ভরে গেলে মেঘে সেই চেনা পথের ওধারে
কী যেন সে বৃক্ষের বাহার। টান পড়ে নাড়ির ভেতরে
ডুব দিয়ে ছুটে যায় মন তার আগে, পায়েরা সে তাল পায় না।
সেই চেনা বৃক্ষের রূপ—কতকাল তবু সেই কালো গাঢ় মায়া একখানা।

তমাল সেজেছে খুব, সবগুলো পরীডানা মেলে দিয়ে দারুণ
বাতাসে—সেই আহা কালো পরী রূপ, টান ধরে মনে। তারপর
ভোজবাজি করে, সম্মোহনে খোদায়ী পালা আসে। নিস্তর
দেহ সব আগে, তারপর সচলাঙ্গ মন...এইমত রীতি।

এই রীতি বহুকাল...ঠিক ধরো আমাদের চার বার নশ্বর তরী
তবু তার হদিস মেলে না, নাই কুল, নাই কোনো ভুল করা যতি। তবু—
নাই ক্লান্তি, নাই ক্লেশ—নিরন্তর এই ছুটে চলা—তমালের নিকশ
কালো আসমান দেহে—টানে খুব, প্রতিবার টান দেয় নাড়ির ভেতরে।

তমাল কারণ নয় জানো। নিমিত্ত সে আর কিছু নয়। তবু তার মানে
সব লেখা আছে কিতাবের পাতায় পাতায়। খোদায়ী নিমিত্ত সে—সাধ্য কী
তুমি আমি, আমাদের নশ্বর কাল, তাদের তালাশ করি।

আসমান ভরে থাকা মেঘে টান পড়ে, বৃষ্টিরা আসে। তারপর খুলে যায়
আমাদের সবগুলো পাহাড়ের আগল। তমাল দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়—নিমিত্ত সে
আর কিছু নয়।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১৬ নভেম্বর ২০০১

লাল সাইকেলটা চীন থেকে আসা

চুলের গন্ধগুলো ইদানিং বড় রগচটা আর একপেশে—
মদির তবুও করে কিন্তু ভীষণ ঝাঁঝালো আর
প্রশিক্ষিত নাকেদের জন্য। তাছাড়া কারখানার বোতাম আর
আলপিনের মত সব গন্ধ এক সাইজে আনা। তথাপি
উড়ুউড়ু নরনারীকুল এখনো অপার আস্থায় চুল
নিয়ে কথা বলে সাইকেল সংক্রান্ত আলোচনার কালে।

সেই চুল উড়ে বেড়ায় নগরের বিষাক্ত বাতাসে
প্রশিক্ষিত আসক্ত নাকেদের আশপাশে
চালকের নিবিড় নেশায় সাইকেল চালনার তালে।

তারপর...
তামা রঙে লাল গোলানো ঝকঝকে সাইকেলখানা
গন্ধনেশাতুর যাত্রীযুগল নিয়ে ঢাকার রাস্তায় ঘুরতে থাকে। আর
আমরা তখন সাইকেলের ঠিকুজি বের করতে বসি, ব্র্যান্ডনাম ইদানীং
খুব সোজা, জানা যায় চীনদেশ এই বাহন বানায়। বাহ!
ঘরের ঘুপচিতে রাখা পেরেকে ঝোলানো জলপাই সবজে টুপিটা
তখন উৎসাহে বের করি চুপি। এই তো এই আহা লিবারেশন আর্মির
টুপি, কতকাল শিক্ষিত লোকে বিভ্রান্ত চোখে চে'র বলে করে
গেছে ভুল (আমাদের করিবার ছিল নাতো কিছু, তাহাদের অজ্ঞতা
বড়ই অতুল)—পর্যটক মনলোভা টুপি।

সবকিছু ঠিকঠাক যখন চলছিল একদিন বিষণ্ন দুপুরে হঠাৎ
গন্ধখানা নিশপিশ ঠেকে। এযেন ঠিক তেমনটা নয় যে গন্ধ চুলময়
করেছি কামনা।

বাইরে রোদ্দুরের তাপে ঝাঁঝালো লাল জ্বলতে থাকে—
টুপির খচিত তারকায়, সাইকেল শরীরের ইস্পাতে, তামাটে।
একখানা মানানসই শ্যাম্পুর অভাবে আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি, জানতে পাই
চীনদেশের শ্যাম্পু অত সোজা কথা নয়। এ পথে ও পথে নানান
শপিং মল—আমরা নিদারুণ চীনাগন্ধলোভে সফর পাড়ি। প্রতিবার
ক্লান্তিতে অবসাদে ঘামে বিফল হয়ে ফিরি, নেশাময় সফর
তবু চলে—দিনের পর দিন ঝাঁঝালো রোদে আর ভিড়ে ঘষা খেতে খেতে
সাইকেল আর টুপির লাল তখন ম্লান হতে থাকে। আমরা হতাশায়
পুড়ে মরি।

সংস্কারবশে চীন কতনা অসাধ্য কাজ করেছে সমাধা!
সাইকেল যাত্রীদের বাসনায় শুধু বাধা?
আমাদের চোখেই কেবল ধাঁধাঁ?
শ্যাম্পুর কারখানা উদ্যোগ নিলে আমরা যুগলযাত্রী চীনদেশে দিতে চাই চাঁদা।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৭ আগস্ট ২০০২

যুক্তি-প্রযুক্তি-ভক্তি

বলো সখা কোন্ পথে যাবে?
যুক্তি আছে, প্রযুক্তি নতুন সংযোজন—
যে পথে যাও তামাম দুনিয়ার কনসেন্ট
তোমার চলার সাথী। বেছে নাও।

এইমত পরামর্শ দিতে কিঞ্চিৎ বিতর্ক
করা লাগে। আরেকটু অকিঞ্চিৎ ঝই-ঝগড়া
সভ্যতা বিষয়ক। যুক্তি কি প্রযুক্তির পথে
বড়সড় বাধা? কখনো কি ছিল?
আমাদের বিবেচনা বলে প্রযুক্তি যুক্তির বাড়া।
যুক্তির বশ্যতা নিয়ে কিছুদুর অনিচ্ছা চলে,
সেইরূপ ইতিহাস আমাদের অতি অল্প জানা।
প্রযুক্তির বশ্যতা তর্কের অতীত—
মনুষ্য লাগি ইহা উপকার করে—এই জ্ঞানে
কোনোরূপ মোকাবিলা দায়।
ভক্তি নিয়া কীইবা আর কব?
ইহার আলাপ কেবল মূর্খরাই করে। যুক্তিহীন
অজগোঁড়া যারা। যাহাদের জীবনে প্রযুক্তি
ফেলে নাই আলো। যুক্তি দিয়া ভক্তিরে
কুপোকাৎ করে নাই তারা। তাহাদের
ভক্তিবোধ ধিক্কারে সোজা করা লাগে।

তারপর, আলাপ-সালাপ বিতর্কের
শেষ হলে পালা, যুক্তির বশ্যতাভারে
আমাদের গোদা পায়া ভারী।
মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড় জাগি
আমাদের ভক্তিভাব অতিবেগে চলিতেছে খুব—
যুক্তি আর প্রযুক্তির চাকা—তাহাদের পথের দিকে
ভক্তিভাব উর্ধ্বলোকে ছুটে যেতে আছে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১৬.০৯.০২

দাঁড়িয়ে আছি

এইখানে দাঁড়াবার কথা ছিল না। সরে যাবার
প্রেষণা কিংবা নড়চড় হবার অন্তর্গত গড়ন—
ঠিকঠাক মজুত ছিল, তবু দাঁড়ানোই নিয়তি
হয়ে গেল।

এইখানে দাঁড়াবার কথা ছিল না। ভেসে যেতে
ইচ্ছা কার না হয় বলো! তবু ভাসিবার
রীতি আছে, নেহায়েৎ অজ্ঞতাবশে সেই
রীতি রপ্ত হ'ল না।

এইখানে দাঁড়াবার কথা ছিল না। যতবার
দাঁড়াবার স্মৃতি জাগে মনে, ভয় হয় হিম ধরা
শ্যাওলা পুকুরের। প্রতিবার কবরেরঘ্রাণ
শেকড় ধরে টানে।

অনিচ্ছুক নিরুপায় ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে
আছি। ভাসিবার চলিবার অজ্ঞতা দেখা দেয়
যদি—এইরূপ সংশয় জাগে।

জাবি ক্যাম্পাস, ঢাকা ॥ ১৮.০৯.০২

মধ্যরাতের সিন্দুক

মধ্যরাতের সিন্দুক ভাঙা শব্দ
তুমিও যেমন, আমিও শুনেছি তাই
নিমীলিত সেই রাত্রির খেয়া পার
আমার তখন প্রহরের চাষে ঠাঁই।

স্তব্ধ সজাগ হিসেবের মাথা সোজা
আশ্রয় ছিল সিন্দুকে মুখ গোঁজা
অমন পাষাণ—কেইবা টানবে বোঝা?
কোনোদিন সেটা খেয়ালেও আসে নাই।

মধ্যরাতের সিন্দুক ভাঙা শব্দ
শুনছি যখন—সংকোচে সন্ত্রাসে
ভয়ে বিস্ময়ে কুঁকড়ে গিয়েছি ঠিকই
কড়িলোভে পড়ে হাসি চাপা উল্লাসে।

কে না জানে সিন্দুক ভাঙা কী যে!
দস্যুবৃত্তি লুকিয়ে আছে বীজে
নিজের সঙ্গে লড়াই কীভাবে নিজে?
এরূপ বিলাপ মস্তিষ্কে ভাসে।

মধ্যরাতের সিন্দুক খুবই ভারী
সে হিসাব খুবই সহজে করতে পারি।
হৃদয়খানা বন্ধক ছিল তাতে
সিন্দুক ভাঙে নিমীলিত রাতে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৭ অক্টোবর ২০০২

কীর্তনিয়া

কীভাবে আরম্ভ করি সুর তালে পাইনাকো দিশা
কোথায় ঈশ্বর থাকে তার কোনো সূত্র মেলা ভার!
তবু, তিনকাল অষ্টপ্রহর নাম জপে যাই দাদরায়,
ঝাঁপতালে ঝাঁপ দিই। উত্তরীয় চোখের কোণে মুছি।

কবে কোন গেরস্তির উঠোন পেরিয়ে আর হাঁড়িমায়া ছেড়ে
মাঝরাতে বেঘুম শিহরণ। বাতাস মাখে শচীমাতা, আর
সব স্বজনের নিঃশ্বাসের ভার। সেই রাতে ফ্যাকাশে জোছনায়
আর সব অনন্ত স্মৃতি মুছে ফেলার ভাণ-ভণিতা করে
আঁচলের খুট চেপে চোখে, চলে আসি।

আজ এই মধ্যরাতের নামে সংকীর্তনে—সেই একই দ্বিধা
কোথায় ঈশ্বর থাকে তার কোনো সূত্র মেলা ভার!
তবু মাগো, সজল চোখে তুমি আছো এই সমুখে বসে
দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গনে তোমার ছোঁয়া পাই—
তোমায় ছাড়া আমি কারই বা ছোঁয়া পেতে পারি?
কোথায় ঈশ্বর থাকে তার কোনো সূত্র মেলা ভার! আর—
অলীক মায়ায় কোনো মাকে ছেড়ে এসেছি সেই জোছনার রাতে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৬ অক্টোবর ২০০২

বুক ভেসে যায় রামপ্রসাদী সুরে

কালকের সারাদিন ধরে লং প্লেয়ারের স্বপ্নটা মাখামাখি ছিল
দারুণ বিভোর হয়ে টাকা নিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে—
ওইকাল ওই ঘন কাল প্লেয়ারের চাকায় আমাদের চোখের সামনে
ঘুরবে, আমাদের নিবিড় শ্রুতিতে, আমাদের মননে, মগজে।

আজ তবু নির্জীব থ্রি-ইন-ওয়ান ফ্যাকাশে আলোয় গা মেখে,
একপাল ছন্নছাড়া সিডি মাথায় করে ছড়ানো বইয়ের মধ্যে
চুপচাপ শুয়ে। কোন গান দিতেছে না। একটুও ইচ্ছে হয় না চালাই।
কোনো গান বাছাই করা শক্ত, সম্পাদনা খুবই শক্ত বর্তমান কালে।

এইরূপ নিদারুণ কালে, কীভাবে বয়ান করি—
কোন্ সুরে ভেসে যায় অন্তরের গহীন প্রান্তর। বুকময় নি-শ্বাসের ছন্দ
গেঁথে দেয়। নস্টালজিক তত্ত্বকথার ভয়ে ভীষণ সংশয়, তবু
বুক ভরে যায় রামপ্রসাদী সুরে। বুক ভেসে যায় রামপ্রসাদী সুরে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২

রাস্তা জানা আছে এই জ্ঞান এক প্রকার অহংকার বিশেষ

তখন রাত্রি নামার সময় এসে গেছে আর আমাদের সব পথে আঁধারের ছায়া। তবু কোনোরূপ বিচলন ছিল না। কারণ আমরা নিরন্তর পাখিপড়া করে আছি, জানা রাস্তায় আঁধার আর আলো কোনো প্রভেদ করে না। এই হচ্ছে আঁধারের সাথে আমাদের সম্পর্কের অন্তঃসারকথা। আজ তবু নির্বিচার মায়া ঘোরালো-প্যাঁচালো কর্তব্য বিচার পথে গোলমাল সাধে। আমাদের বাধে। রাস্তার জ্ঞানলাভ ভার হয়ে বুকে চেপে বসে। বরাবর জানা ছিল কোনো জ্ঞান নিপাট নিঃসীম বরাবর নয়। জ্ঞানেরা পরস্পর যুঝে যায় পথ, তথাপি পথ ছিল চেনা। নিরন্তর প্রহর গণনা চলে, পথেদের নিশ্চিত নিবাস জ্ঞানের ভরসায়। আজ তবু নির্বিচার মায়া। জ্ঞানের সাথে মায়ার বোঝাপাড়া নাই। নিতান্ত বেহদ্দ দুই পথ। মায়ার বাঁধনে পড়ে নিশপিশ মাথা জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করে শুধু। রাস্তারা পড়ে থাকে। আলো-আঁধারির ভেদ আজ অহংকারী আত্মার উন্মোচন ঘটায়।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০২

শেষরাত্রের বৃষ্টি

শেষরাত্রে কাল নাকি আজ যখন বৃষ্টি নামে—
পূর্ণিমার বিগত রাত্রির কাল ভার হয়ে বুকে চেপে ছিল। তবু
সেই বৃষ্টি মায়াবীজালে ডাকে।

জানালার গরাদে ভরা আকাশ আর নিরুচ্চার
মুখভার মেঘ। এইসব ফ্যাকাশে হিসেবে
সায়মনা হবার কোনো উপায় ছিল না।

আমি করতল জানালাতে পাতার কথা ভাবি—

সেইক্ষণে বিদ্যুতের লোভ প্রাইভেট কম্পিউটার বেয়ে
আমার দুচোখ, মস্তিষ্ক আর করতল মাখামাখি দশা।
রোজকার স্বেচ্ছাবাঁধা ছক বিমূঢ় করে রাখে।

আমি করতল জানালায় পাতি না।

তারপর বৃষ্টি থেমে গেলে—
ছাদের ওপর তখনো পানির স্রোত
সমুখের ছাদে গরাদ গলিয়ে হাত বাড়াই।

খর্বাকার, কত খর্বাকার আমি।
বৃষ্টি আমায় এ কোন আকালে রেখে গেল।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩: ভোর ৫:৫১

পতনকালের সখা

তারপর শেষ সিগারেটও যখন শেষ হয়ে গেল
আমাদের চারপাশে নানাবিধ এন্তেজাম, উত্তেজনা
আমাদের কাল ভরে থাকে।

বৃষ্টির জলেরা পথ সব পিচ্ছিল করেছে—
খানাখন্দ রাস্তায় টলটলে পিচগোলা পানি
মেপে মেপে পা ফেলি আমরা।
আমাদের অবয়ব সেই জলে প্রতিবিম্ব ফেলে।

আমরা আছাড় খেতে পারতাম। খাইনি।

বিদায়ের প্রস্তুতি শেষে আমরা বিদায় নিই
আর অভিনন্দন জানাই, পরস্পর, নিপুণ এবং
আন্তরিক।

আমাদের অবয়বগুলো রাস্তার পানির মাঝে
পিচগোলা, পোড়া পেট্রলমাখা
বাতাসের সাথে তবু খেলা করে চলে।

অবয়ব যে নেহায়েৎ আইডিয়া নয় এই বোধ
আমাদের গাঢ়তর ক্লান্ত করে দেয়। আমরা
তাহলে কীসের অভিনন্দন জানিয়েছি? এই কি
যে আমাদের আসলে পতনেরই কথা! আর
কিছুতেই আমরা পতিত হইনি!

জলে, পিচের রাস্তায়, তাহলে কার মুখ ভাসে?

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

পিপীলিকার সারি

আপনার সঙ্গে তখন নানাবিধ আলাপ—
আর আপনি সেসব প্রসঙ্গে মশগুল বলে যান
হরেক দরের কথা। সেইসব অসমাপিকা
আর অসমাপিকা ক্রিয়ায় ভরা আপনার বলাগুলি
নির্বিষ গুঁইসাপের মতো মেঝেতে পেট পেতে
শুনে যাই গাঁইগুঁইহীন।

তিনবার আপনি মেঝেতে টাইলসের পরিচ্ছন্নতা
বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ম্যানুয়েল ছেড়েছেন। আমি শুনেছি।
একবারও বলিনি যা বলবারই কথা ছিল:
'মেঝেতে সাদা টাইলস তো সাদারা দেয় আঁধার বলে'
দুইবার এসংক্রান্ত একটা এ্যাকাউন্টস পেশ করেছেন
আপনি। এ বাড়ির খর্চাপাতি সব। আমিও গ্রহণ করেছি।
যদিও আমার ভয়পনা ভোঁতামুখ দেখানোর কথা।
আমি সেটাও এড়িয়ে গিয়েছি।
বাথরুম না চেপেও বার কয় গেছি শুধু আপনি তার
মাহাত্ম্য সরেজমিন আরেকবার দেখাবেন বলে।
এইরূপ প্রীতি আমি দেখিয়েছি আপনার আর শুধু
আপনার বাড়িটির প্রতি।

অথচ ....

অথচ একবারও আপনি বললেন না এইসব টাইলসের
ফাঁকে একসারি পিঁপড়ারা আসে, নির্বিচার গতিবিধি তার।

পাছায় কামড় খেতে খেতে আমি এক দুই ... এতদিন
অনেক দুষেছি আপনাকে। কে না জানে এইসব প্রাণীদের
দিনভর দংশন-আকাঙ্ক্ষার কথা!

আর আজ
আপনার টাইলস আর বাথরুম আর কোনোকিছুই নয়—
এইসব পিপীলিকারাজি আমার একান্ত আপনার জন।
কুরুক্ষেত্রে এমনই হয়—
আপনি যুধিষ্ঠির আর আমি দুর্যোধন।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ১৩ অক্টোবর ২০০৩

নাস্তা

রুটি খেতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি
সেঁকার কথা বেবাক গিয়েছি ভুলে
আলুপটলের ছেঁছকিও নেই ভাজা
আচারের থালে কফি এনেছি গুলে।

এসব পথ্য রুচির খোঁজে ছিল
অভ্যাসে তাই বিরতিতে কাজ নাই,
তিতাস গ্যাসে ভরসা কীসে কালকে
হাসিমুখে তাই এদিয়েই আজ খাই।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ১৩ অক্টোবর ২০০৩

আমার তখন কোলবালিশে মাথা

এন্টেনাতে টেরেস্টিয়াল খুঁজে
কলিগবৃন্দ খবর পেড়ে আনে।
নতুন চাদরে শীতের মাথা গুঁজে
সামনে আসি হৃৎকম্পের টানে।

চিরাচরিত খবর পাঠক ঠিকই
খসখসিয়ে ঘষতে থাকে পাতা।
বিলাতী সোর্সে সাদ্দামকে দেখি
আমার তখন কোলবালিশে মাথা।

ঢাকায় ফিরে ত্রিশ চ্যানেলে চোখ
আরেকটিবার যায় কি দেখা তাঁকে!
খবর-পাড়ার আধুনিকতম ঝোঁক
বেয়াড়ার মত কৌতুহলের ফাঁকে।

বিজয়ীদলের প্রধান সেনাপতি
ব্রিফিং সারেন ঘাড়ে-গর্দানে যথা।
বার্তাগুলোয় চিন্তার বাড়ে গতি
তখনো আমার কোলবালিশে মাথা।

কাগজে কলমে প্রস্তুত হয়ে বসি
বিশ্লেষণের বুদ্ধিবৃত্তি চষি।
ইরাকী সমাজে আগামীকালের কথা
তখনো আমার কোলবালিশে মাথা।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৩

ইনফ্লুয়েঞ্জা

সকালে যখন রোদ্দুর উঠেছে কাঁসার মতন
আমি বেমালুম ভুলে গেছি সব, গত দুদিনের ধোঁয়াশায় ভরা সব ভাবনা।
গুলিস্তানের ফুটপাতে কেনা বিলাতি কম্বলের সব রোঁয়া এখনো উঠে যায়নি, তার ভেতরে শুয়ে শুয়ে কফালো গন্ধে আমি ছটফট করেছি। তখনই ভাবলাম কবে আবার সেই কাঁসা-রোদ উঠবে আর আমি ছাদের এধারে—
আমার কম্বলখানা রোদে দেব।
রোদ্দুর অন্তত শ্লেষ্মার গন্ধ থেকে আমায় ছুটি দেবে।

ইউরোপের সহকর্মী বাংলাদেশী রোদ্দুরের তারিফ করছিল। আর আমি
তখন পরম আনন্দে বহুদিন পরে জাতীয়তাবাদী হয়ে গেছিলাম। তারপর আবার যখন কম্বলের ভেতরে শুয়ে শুয়ে শুকনা বিস্বাদ পাঁউরুটির দুঃস্বপ্ন দেখি—
আমার মনে ঘুমছোটা প্রশ্ন ঠেলা দেয়
রোদেরা কি কখনো জাতীয়তাবাদী হয়, কিংবা পাঁউরুটিরা?

আজকের রোদ্দুরে পয়লায় পাঁউরুটির কথা, তারপর এমনকি কম্বলের কথা ভুলিয়ে দিল। আর আমি চাদর মুড়ে কাঁসা-রোদে নেমে পড়ি। এপাড়া ওপাড়া আমার ঘোরাঘুরির নিমিত্ত শুধু রোদ—কিংবা অন্যকিছু আমার তা মনে পড়ে না। কোথাও কফালো গন্ধগুলো নেই।

চাবি ঘুরিয়ে দরজার পাল্লা খুলতেই আমার মনে পড়ে যায় কম্বলের কথা—
শ্লেষ্মার গন্ধের কথা। অথচ আবার কাঁপুনি উঠতেই আমি কম্বলের ভেতরে ঢুকে পড়ি আর আবার রোদ্দুরের কথা ভাবতে থাকি।

কম্বলটা রোদে দিতে হবে।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০৪

চড়ুইরা তবু আসে প্রতিবেশীর ছাদে

আধপেটা তেলের পিপেগুলোতে মাটি ভরে পেয়ারাগাছ লাগিয়েছিলেন
প্রতিবেশীরা, একটা বোধহয় গন্ধরাজও ছিল—
তাদের শরীকী ছাদে তিনখানা পিপের মালিকানা নিয়ে আমার বেজায় কৌতুহল
হতো, আর আমি প্রতিবার ভুলে যেতাম আমার জানালার
সমান্তরালে সেগুলোতে চড়ুইদের সমাগম দেখে।

চড়ুইগুলো স্বভাবমাফিক—সারাদিন ছোটাছুটি করে
এ ডালে ও ডালে বসে। ডাকাডাকি করে। তারপর এধারে শুকনো
রোদকাঁচের জানালাটা দেখে সুরুৎ করে চলে আসে আমার জানালার ওপারে।

কখনো কখনো আমার আফসোস হয়—জানালাটা বন্ধ আছে বলে, আর
সেটা খুলে দিতে ভয় হয় যদি শব্দে ভয় পেয়ে চড়ুইগুলো পালায়। কখনো
কখনো আমার স্বস্তি হয় ভাগ্যিস এই কাঁচের জানালাগুলো হয়েছে। নইলে
খোলাজানালা দেখে কোন চড়ুই কি কখনো ওধারে বসত!

একদিন সকালে – সেদিন রাতে আমি এন্তার ঘুমাই,
মধ্যদুপুরে ঘুম থেকে উঠে প্রতিবেশীর রোদগালা ছাদে তাকাই। পিপেগুলো
তারা খালি করেছেন। আর ঝাঁকড়া গাছগুলো আধশোয়া দেখে আধাবিলাতি
কুকুরটা বেজায় খুশিতে লাফাচ্ছে। আমি ওর শেকলের শব্দ শুনতে পাই।

কী বিত্তান্ত জানতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমি এমনকি তাদের সদর দরজাও
কখনো দেখিনি, কেবল ছাদ। আর চড়ুইগুলোর আশা আমি ছেড়েই দিলাম।

তিনদিন কি চারদিন ঘুরেছে, আধাবিলাতি কুকুরটা ওই ছাদে শেকলবাঁধা
খামকাই লাফায়। আর নেতিয়ে পড়া তিনখানা আধশোয় ঝাঁকড়া গাছ
প্রতিবেশীরা সরিয়ে নিয়ে যায়। সেদিন পড়তি দুপুরেই চড়ুইরা আবার
ফিরে আসে। এখন থেকে রোজ। ওরা একবার ওই ছাদে ঘুরনা দিয়ে
ফেরে—তারপর এই রোদকাঁচের ওপারের সামান্য জায়গায় বসে।

এই এতদিনেও আমি ধন্দে পড়ে আছি—জানালাটা খুলব কিনা।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪

সম্পাদক নববান্ধবের কাছে পত্র

রাইসুকে

আমি জেনেছি নানান বাদে আপনি বিবাদী, কিন্তু সহকর্মী জনাব,
আমিও নানান বাদে বাদী হয়ে নেই। এটাই ছিল আমার প্রাথমিক
প্রার্থনার জায়গা—আমরা যাতে শুনবার কান আরেকটু প্রশস্ত করি।
—আপনার, ও আজকের প্রজাদের কাছে।

আপনি জেনে ব্যথিত হবেন, এক যে নির্বিষ ভোঁতামত গল্প আমি লিখেছিলাম—
তার জন্য শাহবাগে আমার মুÊপাত হয়েছে। সমস্বরে বহুলোকে আবিষ্কার করেছে
আমি 'মালাউন' রেফারেন্ট দিয়ে বিজেপির দরবারে এ্যাপীল করেছি। অশরীর
থাকি আমি শাহবাগে—হয়তো সেকারণ হেতু মুÊু আমার অক্ষতই আছে।

অথচ এও আপনার মনে পড়বে, আফগানিস্তানে যখন মার্কিন হামলা চলে, আর
আমি একখানা আফগান সরকারী-ভাষ্য অনুবাদ করি, আর আপনি সমাদরে তা
ছেপে দেন—আমার সেক্যুলার বান্ধবকুল নিদারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে যান।
এটুকু সান্ত্বনাও তাঁদের জোটে না যে আমাকে তাঁরা মুসলিম মৌলবাদী সাব্যস্ত
করবেন—তালেবানের বাংলাদেশী সখা—আমার মাতৃপ্রদত্ত নামে আর রাষ্ট্রীয়
নথিতে পাকাপাকি আছে আমার হিন্দু পরিচয়।

সেদিন পাকিস্তানী বিজলিডাকের বন্ধু নাখোশ জিজ্ঞেস করেছে আমি বিহারী কিনা।
নাহলে আমার 'ক্লে বার্ড' নিয়ে কথা থাকে কীভাবে! কী কথা আমার ছিল তার
সনে—সেটিও আর আলাপিত নয়।
ফলে কায়ক্লেশে আবারো জানাতে হয়—
আমার হিন্দু পরিচয়।

এখন দেখেন,
সেক্যুলার বিশ্বাসে আমার ঈমান পাকা নাই, তাই কী ভেজালে দিনপাত করি!
আজকে মুসলিম মৌলবাদী থেকে কালকে বিজেপির চর। কখনোই আপন নয়,
আজকেও পর আর কালকেও পর।

কাগজের শাসন আমরা জানি—কতদুর জানি এনিয়ে আর ভরসা পাই না। আর
কাগজের অনুচর যারা তাদের শাসন-কথা কীইবা আর কব, আধভয়ে মরা হয়ে
যাই! এসব কাহিনী ফেঁদে আপনার কাছে কোনরূপ অনুকম্পা ভিক্ষা করি না। যে
যুগ শাসায় আমাকে, সেই যুগই আপনাকেও তাই।

আপাতত দিনমান পঞ্জিকা খুঁজে মোদের মিলনবেলা ধার্য করার ব্যস্ততা নাই।
ঘটকালি আদি পেশা, যার ঘটে কিছু আছে তার বেলায় ভালমতই ঘটে।

আমি বুঝেছি নানান বাদে আপনি বিবাদী, কিন্তু সহকর্মী জনাব,
আমিও নানান বাদে বাদী হয়ে নেই। শুধু বরবাদ করবার সদর রাস্তাগুলো
ভালমত বুঝে নিতে চাই – শব্দ-অনুষঙ্গ শাসায় আমাকে, আপনাকেও তাই।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪

ম্যানুফ্যাকচারিং ঐক্য

সুমন রহমান, বন্ধুবরেষু

আমাদের মাঠে-হাগা ঐতিহ্য মোকাবিলা করে, কিংবা আরো নির্ভুল বলি—
সে ইতিহাস ধামাচাপা দিয়ে আমরা এসেছি আজ নতুন এক ঐক্যের
যুগসন্ধিক্ষণে। উন্নয়ন মোদের সহায়।

আমরা দেখেছিলাম রাজধানীর বুক চিরে গুয়ে ভরা স্রোত,
আমাদের চোখের অতীতে সেই মোঘলেরা উপনিবেশ-শহরের অচেতন
পাণ্ডুলিপি রচনা করেছে। তারা জানেনিও তা।

সেই থেকে স্যুয়ারেজ স্যানিটারি প্রত্নলিপিগুলো, স্থাপত্যনমুনা—পূর্ত অধিদপ্তর
শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভুর মাথাব্যথা হয়ে কতবার প্রকল্প কত ডিম পেড়েছে,
হেগেছে, আর ধুয়েছে। আমরা খুবই ভাল বুঝি।

হে বন্ধু আমার, ৮০'র দশক ধরে মিস-হওয়া বন্ধুত্বের কসম—তুমি জান
এই কাল আমাদের নবায়িত কাল। মহাকাল, আবার সংশয়ের সম্ভাব্য আকাল
পথ জুড়ে ভূতনৃত্য নাচে। কথা কইবার ক্ষণ।

আমার কোথাও দ্বিধা ছিল নাতো, ম্যানুফ্যাকচারিং ঐক্য যতই বুর্জোয়া ঠেকুক
এই হচ্ছে আমাদের যৌথ পরিব্রাজনের কার্যকরী পথ—প্রতিবেদন প্রতি রাতে
পয়দা করে চলি। কবিতাও তাই।

বিশ্বদারিদ্র্য যাবে, জোলাপ-দাস্ত যাবে, হাগু বন্ধ হয়ে যাবে! কত না ঘোষণা!
আমরা জানি কিছুই হবে না, শুধু সামাজিক পানিগুলো বোতলের মধ্যে
ঢুকে ইতিহাস হবে। আমরা আগায়ে নেব!

সব বর্জ্য কদাকার নয়, কর্জ শুধতে বর্জ্য ঘেটে চলি—তুমি আর আমি।
এই হচ্ছে আমাদের মিলনের মেনিফেস্টো গাথা। প্রতিবেদনে আর কবিতায়
দিবারাত্রি ভাগ। জয়তু ঐক্য।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪

কলকাতায় শিমুল-পলাশ

শহরের রসায়নবিদেরা, কিংবা অন্য কারা করেন সে বিষয়ে
তেমন কোন ধারণা নেই আমার—তাঁরা বাতাসের সীসা মাপেন।
মেপে শেষে বলেন কোনখানটা বসবাসের উপযোগী নয়। এই শুনে
পশ্চিমের পর্যটকেরা ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান।

পরিসংখ্যানের সঙ্গে আমার এইরূপ সম্পর্ক নয়—ফলত গুটিকয়
যে শহর আমি চিনি, সেখানের বাতাসে বুকভরে দম নেবার অভ্যাস
আমার। পরম প্রশান্তিতে কথিত সীসা আর ধুলা সমেত আমি
শ্বাস নিতে থাকি—রোজ রোজ প্রতিদিন।

আরো কিছু খোঁজ আমি নিয়ে চলি সীসা আর ধুলার অধিকন্তু—
মাছের কানসিতে হুল ফুটিয়ে রক্ত খাওয়া নীলাভ মাছি, বেড়ালের
মরা-জ্যান্ত লোম, যে নিঃশ্বাসেরা প্রতিদিন সকালে সমাগত হয়
বাতাসে। অবসাদে, অগৃহে, অনসূয়ায়।

তার মধ্যে গতকাল শিমুল আর পলাশগুলো দেখা দেয়।
ওরা ভেবেছিল এই দৌড়াদৌড়ি আর ধুলার আস্তরে লুকিয়ে থাকা বুঝি খুব
সোজা কলকাতায়। হয়তো হয়েও যেত কিন্তু বাসের জানালাতে ঘাড় গুঁজে
আমি ওগুলোই খুঁজতে ছিলাম।

দেয়ালের ওপারে বিমানপোতের হলদেটে আলো ইন্দ্রজাল। মাঝখানে
মশা আর জোঁকের খামার। তার এপারে পুববঙ্গীয় মানুষের প্লট কেনার
বাহারি অস্থির নেশা। কজন সাঁওতাল যেন এ পাড়ায় বাস গেড়েছিল—
সে নিবাস প্লট হয়ে খেদিয়ে দিয়েছে তাদের।

এ গল্প আমি শুনেছি বহুদিন আগে। তখনো শিমুলের খোঁজ নাই।
পলাশের খোঁজ নাই। এ গল্পের জটিলতা কিছুমাত্র আবিষ্ট করেনি
আমাকে, কিছুমাত্র বিভ্রান্ত করেনি। যদিও তখন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরেদের
সঙ্গে আমার নিত্য কথা হয়।

ও পলাশ! ও শিমুল! তোদের সঙ্গে দেখা ছিল না কতদিন। অথচ
সে কথাটিও আমার বিস্মৃত ছিল বোধহয়। আমি ঢাকার শীত চলে যেতে
দেখলাম কিনা! দেখলাম কি? তারপর শিমুলের খোঁজে কি ঘুরলাম পথে?
রসায়নবিদ থেকে মুক্তি দেবে এমন কি একজনও নেই?

কলকাতা ॥ ০১ মার্চ ২০০৪

মিসেস ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

টেলিফোনে তিনি ইংরেজি, উর্দু আর মাঝেমধ্যে বাংলার মিশেলে
আমাকে রাস্তার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আর আমি ছিলাম সোৎসাহ।

এটিই নেহায়েৎ নানাকিছু বশতঃ ছিল আমাদের প্রথম সংলাপ—
প্রথম সংলাপেই আমরা প্রথম সাক্ষাতের দিনক্ষণ পাকা করি।

তিনি বলেছেন, টেলিফোনে, আমাদের সাক্ষাৎ আরো বহুকাল
আগেই হওয়া দরকার ছিল। তিনি হতে চাইতেন মেনকা বা রম্ভা।

আমি বলেছি, কিন্তু আমার মনে হয়না খুব দেরি কিছু করে ফেলেছি—
আর কে না জানে কখনো দেখা না হবার চেয়ে এখন দেখা হওয়া ভাল।

আর আমি যখন একেবারে সাজানো চাঁতালের মধ্যে ঢুকে ইতিউতি
খুঁজতে যাব, মিসেস ভৌমিক তখন ফ্ল্যাটের জানালা থেকে ডাকছেন।

আমি একছুটে সিঁড়িতে বারকয় গোত্তা খেয়ে যখন তাঁর দরজার কাছে
তিনি তখন সাদরে লক্ষ্ণৌ তমিজে আসলেই কুর্নিশ করেন, এবং আমাকেই।

বলেছিলাম আমি খাব না, কিন্তু তিনি যখন নিজহাতে বাড়তে লেগে যান
আমার আর না খাবার কথা তেমনভাবে বলা হয় না। আমি বসে পড়ি।

মাঝখানে একথা সেকথা মূলত তাঁর জীবন কাহিনী। আমি টের পাই ভারি
পাকানো সব সুতো, আমার পক্ষে বেজায় কঠিন, হয়তো তাঁর পক্ষেও।

চলে আসবার কথা বলতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর অস্পষ্ট
মুখ। আমি কী ভেবে চিরায়ত রাস্তা বেছে নিই, চুলের গহীনে চুমু খাই।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই এতবড় বাসায় বাহাত্তুরে বুড়োর কেমন লাগে—
আমি বুঝি কিনা। তুতো-দিদিমার কথায় আমার মুখ ঝাপসা হয়ে যায়।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ০৩ মার্চ ২০০৪

গেরস্থালির আকাশ

সুস্মিতাকে

গেরস্থালির আকাশে কি চাঁদ ওঠে?
সে খবর আর যেই রাখুক আমার তা রাখবার দরকার নেই।

সেবার যখন ঘন অন্ধকারে আমরা সারথি ছিলাম পরস্পরের
আর বৃক্ষদের আবছায়াগুলো সরিয়ে সরিয়ে সওয়ার হয়েছি আমরা
নশ্বর পথে, অন্ধকারে—
তুমি জান কিনা সেই আঁধারে আমি চাঁদের সাথে শর্তযুক্ত প্রণয়
পাতিয়েছিলাম। আর কিছু নয়, শুধু তোমার মুখখানাই একবার
দেখব বলে।

তবু চাঁদ সাড়া দেয়নি।

এসব অনসূয়া আমি খুব ভাল চিনি। আর্ধেক কারণ তার কপালের
ফেরে বহন করে যাই আমি নিজে—এই পুরুষে। অন্যান্য কারণগুলো
নিমিত্ত—আমাদের সম্পর্করাজি বিষম ভাবিয়ে যায়,
আর কিছু হদিশ দেয় না। বেদিশা সম্পর্কের খোঁজ ঈর্ষা ভিন্ন
আর কী দেবে বল!

চাঁদ মরে যাক!

তারপর এই এতদিন পরেও তোমার ঘরে শুনি আকাশ ভাড়া করেছ।
আমার তাতে খারাপ লাগেনি। একখানা ভাড়াকরা চাঁদ তোমার জন্য
আমি নিরন্তর প্রার্থনা করি।

আকাশ, সে গেরস্থালির হলেও চাঁদ ছাড়া খালি খালি লাগে।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ২৭ মার্চ ২০০৪

খেচর-স্বভাব

কখনো জলের মধ্যে, দুরগামী খেচরের
দেখিবার সাধ হয়—
মুখ।

রোদগালা আকাশের, এমত বিচ্ছেদে
আহাজারি করে ভাঙে—
বুক।

তথাপি খেচর ডানা, অবমুক্ত ভাসানে
অধোমুখে ধায়, চায়—
ডুব।

শ্যাওলাগন্ধ মৎস্যজাতি, বিলাপে মাতে তারা
উড়িবার সাধ ছিল—
খুব।

শ্যামলী, ঢাকা ॥ ২৯ এপ্রিল ২০০৪